বঙ্গবন্ধু ও ৬ দফা আন্দোলন

বঙ্গবন্ধু ও ৬ দফা আন্দোলন

অমল কুমার গাইন

বঙ্গবন্ধু ও ৬ দফা আন্দোলন
অমল কুমার গাইন

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ২৭৫ টাকা

Bangabandhu o 6 Dopha Andolon by Amal Kumar Gain Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 275 Taka RS: 275 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98112-5-1

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

স্বর্গীয় বাবা-মায়ের স্মরণে

নিবেদন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং বাঙালির মুক্তি ছিল সুদূর পরাহত। বঙ্গবন্ধু যেভাবে বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে সমস্ত বাঙালিকে আন্দোলনে টেনে এনেছিলেন, তা বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে বিরল। বর্তমান গ্রন্থে সেই রক্তাক্ত সংগ্রামের একটি পর্যায় ছয়দফা আন্দোলন নিয়ে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এই গ্রন্থে আমরা দেখতে পাবো, ছয়দফাকে কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধু সমগ্র বাঙালি জাতিকে কিভাবে একই চৈতন্যে উপনীত করেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যেই প্রণীত হয়েছিল ৬-দফা। এজন্য বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দেয়া হলেও ৬-দফাকে বিচ্ছিন্নতার সনদ হিসেবে আখ্যায়িত করা ছিল কঠিন। কেননা শেখ মুজিবের ৬-দফা ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কাঠামোর অনুরূপ। ছয়দফার বাহ্যিক রূপ কিছুটা নিরীহ হলেও তিনি এর সার-সংকলন করে বলেছিলেন–'কত নিছ, কবে দেবা, কবে যাবা?' অসম্ভব দূরদর্শিতার সাথে ৬-দফা আন্দোলনকে বঙ্গবন্ধু মুক্তিসংগ্রামের দিকে সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যান।

গ্রন্থটিতে মূলত আলোচনা করা হয়েছে পাকিস্তান আমলের সামরিক শাসন তথা ষাটের দশকের রাজনীতি নিয়ে। সামরিক শাসনে পূর্ববাংলার প্রায় সকল নেতাকর্মী যেখানে ভয়ে ও আপসে রাজনীতি থেকে বিমুখ, তখন শেখ মুজিবই বাঙালির মুক্তির দূত হিসেবে আইয়ুব সরকারের সংকুচিত রাজনীতির মধ্যে অধিকার আদায়ে আন্দোলনে থেকেছেন–সেসব প্রসঙ্গ এখানে আলোচিত হয়েছে। একই সঙ্গে রয়েছে আইয়ুব খানের সঙ্কুচিত বা প্রায় বন্ধ রাজনীতির বিরুদ্ধে পূর্ববাংলায় বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলার পাশাপাশি ভারতের সহযোগিতা নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর পূর্ববাংলা স্বাধীন করার প্রয়াস।

বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনাকে বিনষ্ট করার হীন চক্রান্তে সরকারি মদদে পূর্ববাংলায় সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধেও রাস্তায় নামেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর সাহসী পদক্ষেপে পূর্ববাংলা ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা পায়। ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ছিল লক্ষনীয়। ১৯৬৫ সালের ১৭ দিনব্যাপী পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয় ঘটে। এ সময়ে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধের উন্মাদনা থেকে সচেতনভাবে দূরে থেকে বাঙালির নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে গভীর উদ্বিগ্ন অবস্থায় সামরিক সরকারের জনবিরোধী কাজের বিরোধিতা

করেছিলেন। এভাবে ক্রমাগত সক্রিয়তা বঙ্গবন্ধুকে বাঙালি জাতীয়তাবোধ বিনির্মাণের পথিকৃৎ হিসেবে পরিচিত করে।

পাকিস্তানের লাহোরে সম্মিলিত বিরোধীদলের আহূত সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৬-দফা উত্থাপন করেন। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সরকার, বিরোধীদলের এমনকি নিজ দলের একাংশের বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি ৬-দফার পক্ষে জনমত গঠন করেন। সরকারের দমন-পীড়নের একপর্যায়ে ৬-দফা এবং তাঁকে নিস্তব্ধ করার জন্য পাকিস্তানের দেশরক্ষা আইনে তাঁকে গ্রেফতার এবং কারাগারে থাকা অবস্থায় আগরতলা মামলার প্রধান আসামী করা হয়। পূর্ব বাংলার ছাত্র-শ্রমিক ও সাধারণ জনগণের তীব্র আন্দোলনে অবশেষে মামলা প্রত্যাহার করা হয়। মূলত এসব বিষয় গ্রন্থটিতে সবিস্তারে আলোচনার যথাসাধ্য প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

এবার কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালা।

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনকে, যার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় আমার লেখালেখির সূত্রপাত। বলা যায়, স্যার আমার মতো অভাজনকে লিখতে বাধ্য করেছেন। বাঙালির এই শ্রেষ্ঠ মনীষীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

গ্রন্থটি লিখতে আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন প্রাবন্ধিক ও গবেষক, বাংলা একাডেমির গবেষণা কর্মকর্তা মামুন সিদ্দিকী। বন্ধুর মর্যাদায় তিনি এ গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনায় অতুলনীয় সহযোগিতা করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বহু উর্ধ্বে।

সরকারি ব্রজলাল কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শংকর কুমার মল্লিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি আমার নিরন্তর উৎসাহদাতা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আহম্মেদ শরীফ এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. তপন পালিত লেখার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়েছেন। অনুজপ্রতিম দুই গবেষক-বন্ধুর প্রতি রইলো অনেক ধন্যবাদ।

খুলনাস্থ গণহত্যা জাদুঘরের দুই প্রীতিভাজন–উপপরিচালক রোকনুজ্জামান ও গবেষণা কর্মকর্তা সহুল আহমদ গ্রন্থটি রচনায় নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রতি রইলো অশেষ শুভাশীষ।

গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে কবি প্রকাশনী। পাঠকমহলের কাছে আমার এ অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস তুলে ধরার জন্য কবি প্রকাশনীর কর্ণধার সজল আহমেদ নিঃসন্দেহে আমার অজস্র ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

অমল কুমার গাইন
amalgain75@gmail.com

সূচিপত্র

পটভূমি ১১
আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন ১৮
বঙ্গবন্ধুর 'স্বাধীন বাংলা' প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা ২২
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা : ১৯৬৪ ৩০
দাঙ্গা প্রতিরোধে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ৩২
১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং বঙ্গবন্ধুর কর্মতৎপরতা ৩৪
পাক-ভারত যুদ্ধ (১৯৬৫) এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিক্রিয়া ৩৭
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া এবং বাঙালিদের শিক্ষা ৪০
৬-দফা উত্থাপন ৪৩
৬-দফা উত্থাপনের কৌশল ৪৮
সংক্ষেপে ৬-দফা ৫০
৬-দফার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ও পরবর্তী ঘটনাধারা ৫৫
৬-দফা প্রচারণায় বঙ্গবন্ধুর কৌশল এবং সরকারের দমন-পীড়ন ৬২
৬-দফার বিস্তার: ঢাকার বাইরে মফস্বলে ৬৭
৬-দফা: পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া ৭৭
বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ ৮৩
৭ জুনের হরতাল: ৬-দফার বাঁক্‌বদল ৮৪
হরতাল নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষ্য ৯১
৬-দফার প্রভাব ৯৪
উপসংহার ১০১

তথ্যসূত্র ১০৩
গ্রন্থপঞ্জি ১০৭
পরিশিষ্ট ১০৮

পটভূমি

বিশ শতকের ষাট ও সত্তরের দশকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা, বক্তৃতা-বিবৃতির বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে জানা যায় ষাটের দশক থেকে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তি নির্মাণ শুরু করেন। পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসক ইস্কান্দার মির্জার ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র ২০ দিনের মাথায় তাঁকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে ১৯৫৮ সালের ২০ অক্টোবর ক্ষমতা গ্রহণ করেন আরেক জেনারেল আইয়ুব খান। ক্ষমতা গ্রহণ করেই প্রবর্তন করেন সামরিক শাসন। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার অভিপ্রায়ে 'বিপ্লবের' প্রথম বার্ষিকী উদযাপনের প্রাক্কালে ২৬ অক্টোবর ১৯৫৯ সালে আইয়ুব খান 'মৌলিক গণতন্ত্র' প্রবর্তনের ঘোষণা দিয়ে গণতন্ত্রে ফিরতে চাইলেন। এটি 'স্বৈরাচারের মুখোশে গণতন্ত্র'। পোশাকি নাম 'মৌলিক গণতন্ত্র'। রাজনীতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞার অতীত।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনের দিকে নজর দিলে দেখা যায়, এ সময়ে আমেরিকার অবস্থান ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠিত একদলীয় শাসনব্যবস্থা তথা 'প্রলেতারীয় একনায়কত্বের' বিরুদ্ধে। 'মুক্ত বিশ্ব' প্রতিষ্ঠার আওয়াজ তুলে আমেরিকার এ ধরনের তৎপরতা একনায়কত্ববাদী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়ানোর অপকৌশল। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে গণতন্ত্র নেই অন্যদিকে পুঁজিবাদী বিশ্ব গণতন্ত্রের পূজারী; মুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠা আমেরিকার লক্ষ্য এটা প্রমাণ করতে তৃতীয় বিশ্বের জন্য গণতন্ত্রের এমন একটি বিশেষ মডেল তৈরি করে সেটি প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে আমেরিকা অনুগত দেশ পাকিস্তানকে গিনিপিগ হিসেবে বেছে নেয়। আইয়ুব খানকে অনেকটাই প্রকাশ্যভাবেই 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র"-এর মাধ্যমে পরোক্ষ নির্বাচনব্যবস্থা চালু করার জন্য উৎসাহিত ও সহযোগিতা করে। প্রসঙ্গত, কয়েকজন আমেরিকান অধ্যাপক ঠাণ্ডাযুদ্ধের যুগে বিশ্বরাজনীতিতে আমেরিকার সহযোগী দেশ পাকিস্তানকে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বিশ্বপরিমণ্ডলে পরিচিত লাভ করানোর জন্য মৌলিক গণতন্ত্রের রূপরেখা প্রণয়ন করে দেন।[১] চার স্তর বিশিষ্ট এই কাঠামোটিতে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংস্থাসমূহ এক পিরামিড আকারের কাঠামোতে নিচু থেকে উপরে সন্নিবেশিত করা হয়। পিরামিডের শীর্ষে থাকবেন প্রেসিডেন্ট এবং পরেই থাকবেন জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহ। এই দুই পরিষদই বিডি (Basic Democracy) সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবে। এভাবে এককেন্দ্রিক স্বৈরাচারী সামরিক শাসনের মুখে গণতন্ত্রের মুখোশ পরানো হয়।

গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি হচ্ছে এটি দেখানোর জন্য ষাটের দশকের শুরুতেই জেনারেল আইয়ুব খান রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জেল থেকে ছেড়ে দিতে শুরু করেন। উল্লেখ্য, সামরিক শাসন জারির পরে এ সব রাজনীতিবিদদের গ্রেফতার করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি পান ১৭ ডিসেম্বর ১৯৫৯।[২] জেল থেকে ছাড়া পেলেও ১৯৬০ সাল জুড়ে নানাভাবে তাঁকে হেনস্থা করা হয়, কার্যত তিনি ছিলেন নজরবন্দি। ওই সময়ের অবস্থা সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে আগরতলা মামলার জবানবন্দিতে তিনি বলেন, '১৯৫৯ এর ডিসেম্বরে কিংবা ১৯৬০-এর জানুয়ারিতে আমাকে উক্ত আটকাবস্থা থেকে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তিলাভকালে আমার উপর কিছু কিছু বিধিনিষেধ জারি করা হয়-ঢাকা ত্যাগ করলে আমার গন্তব্য সম্পর্কে লিখিতভাবে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানানো এবং প্রত্যাবর্তনের পরেও একইভাবে সে বিষয়ে তাদের অবগত করা। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা এ সময়ে ছায়ার মতো আমার পিছু লেগে থাকতো।[৩]

গণতন্ত্রে ফেরার পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৬০ সালে ১১ জানুয়ারি বিডি সদস্য নির্বাচন এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন হয়। ৯৫ শতাংশ ভোট পেয়ে পরবর্তী চার বছরের জন্য ক্ষমতায় থাকার বৈধতা অর্জন করেন আইয়ুব খান। নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। প্রেসিডেন্টের ওপর জনগণের আস্থা আছে কি-না তা পরখ করার জন্য 'হ্যাঁ' এবং 'না' ভোটের ব্যবস্থা করেন। বাস্তবিক পক্ষে, এ নির্বাচন ছিল একতরফা, লোকদেখানো এবং সংখ্যা সাম্যের ভিত্তিতে। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ পূর্ব বাংলা এবং ৪৪ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানি হওয়া সত্ত্বেও দুই অঞ্চলের সমান সংখ্যক ৪০ হাজার করে ৮০ হাজার বিডি প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। এঁদের ভোটেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। নিজের ভাবমূর্তিকে সুউচ্চে তোলার অভিপ্রায়ে একদিকে নির্বাচন অন্যদিকে ১৯৫৯ সালের ২৬ অক্টোবর নিজেই নিজেকে পদোন্নতি দিয়ে 'ফিল্ড মার্শাল' পদে উন্নীত করেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ সালে শপথ গ্রহণ করেই আইয়ুব খান পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে ১১ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন, এ কমিটিতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ও পরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরীও ছিলেন। এছাড়াও তিনি ২৭টি কমিশন ও কমিটি গঠন করেন। এ সময় পাকিস্তানের রাজধানী করাচি থেকে ইসলামাবাদে স্থানান্তর করা হয়। বিচারপতি শরিফের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশও বাস্তবায়নের তোড়জোড় শুরু হয়। নিজের পক্ষে প্রচারের জন্য লেখক, কবি, বিশেষ করে বাঙালি কবি-সাহিত্যিকদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখাতে থাকেন। এ সময় থেকে 'আদমজী পুরস্কার' ঘোষণা করা হয়। এক কথায় নিজের ক্ষমতার ভিত শক্তিশালী করার জন্য যা যা করার দরকার তাই করতে শুরু করলেন। এগুলোর বেশির ভাগই ছিল জনস্বার্থবিরোধী। কিন্তু সামরিক শাসনামলে জারি

করা 'এবডো' আইন বলবৎ থাকায় রাজনীতিবিদরা ছিলেন কার্যত নিষ্ক্রিয়। এমতাবস্থায় আইয়ুবের দূরভিসন্ধিমূলক অপতৎপরতার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসেন বাঙালি বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রসমাজ। উল্লেখ্য, আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসেই ১৯৫৯ সালের ৭ আগস্ট দুটো অধ্যাদেশ জারি করেন। একটি হলো 'পোডো' (PODO: পাবলিক অফিস ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার), অন্যটি হলো 'এবডো' (EBDO: ইলেক্টিভ বোডিজ ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার)। পোডো আইন প্রয়োগ করে অনেক সাবেক মন্ত্রী ও রাজনীতিবিদদের বিচারের মুখোমুখি করা হয়। এই আইনে বলা ছিল, কেউ যদি আদালতে দোষী প্রমাণিত হয়, তাহলে এবডো আইনে তিনি ১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনো নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের ৪২ জন রাজনীতিবিদকে এবডো আইনে রাজনীতিতে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।[৪]

জ্যেষ্ঠ নেতাদের রাজনৈতিক অনুপস্থিতিতে দল গোছানোর কাজটি এ সময়ে বঙ্গবন্ধুকে একাই করতে হয়। এই কঠিন সময়ে শেখ মুজিবের পাশে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলার আওয়ামী লীগের তরুণ নেতারা এগিয়ে আসেন। অর্থনৈতিক সংকট কাটাতে শেখ মুজিব মার্চ মাস হতে আলফা ইন্সুরেন্সের উপদেষ্টা হিসেবে যোগদান করেন। সরকারি বিধিনিষেধ এবং মামলা-হামলা সত্ত্বেও শেখ মুজিব দল গুছিয়ে তুলতে সক্ষম হন। অবশ্য এ সময়ে দৈনিক ইত্তেফাক এবং এর সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া দল গোছাতে বঙ্গবন্ধুকে বিশেষ সহযোগিতা করেন। বঙ্গবন্ধুর তৎপরতায় স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রলীগের কাজকর্মও এগিয়ে যেতে থাকে।

এ সময় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য বিশিষ্ট ছাত্র-নেতৃবৃন্দ দ্বারা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি মহকুমায় ও থানায় নিউক্লিয়াস গঠন করেন।[৫] 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' আওয়ামী লীগ এবং কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এই বৈঠকের খবরে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগে এবং নতুন পর্যায়ে ঐক্যের সূচনা হয়। বস্তুতপক্ষে এই দুই সংগঠন পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজকে প্রতিনিধিত্ব করত। এ সময় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শেখ ফজলুল হক মণি। তাঁর নেতৃত্বে ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়নের একটি গোপন সভা হয় ৩০ ডিসেম্বর ১৯৬১ ইস্কাটনের এক বাড়িতে। বছরের শেষ দিন ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের নেতাদের মধ্যে উল্লিখিত ওই গোপন বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ থাকলেও শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় যে, সামরিক শাসনের অবসান, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজবন্দীদের মুক্তি, স্বায়ত্তশাসন কায়েম, ছাত্রদের শিক্ষার দাবি-দাওয়া প্রভৃতি নিয়ে সামরিক স্বৈরাচার আইয়ুবের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির সমঝোতার ভিত্তিতে ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে উল্লিখিত ঐক্য ও সমঝোতাই ষাটের দশকের গণজাগরণের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

বাষট্টি সালে আন্দোলনে জোয়ারের সূচনা হয়। অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার যে ভ্রূণের জন্ম হয়েছিল বায়ান্নতে, দশ বছর অতিক্রম করে তা আরো পরিণত রূপ নেয় বাষট্টিতে। দুই আন্দোলনেই নেতৃত্ব দেয় ছাত্রসমাজ। সার্বিক বিচারে বায়ান্নর যোগ্য উত্তরসূরি বাষট্টি। বায়ান্নর আন্দোলন ছিল ভাষাভিত্তিক, বাষট্টির আন্দোলন ছাত্রসমাজের শিক্ষার দাবি থাকলেও এটি ছিল মূলত রাজনৈতিক আন্দোলন। রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনাই ছিল এই আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি। পূর্ববর্তী বছরে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে সমঝোতা বাষট্টির আন্দোলনে গতিশীলতা আনে। শিক্ষার দাবি এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে বছরের শুরুতে আন্দোলন শুরু হয়। উল্লেখ্য, এবডো আইনে রাজনীতির বাইরে থাকা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জানুয়ারির শেষ দিকে ঢাকায় আসেন শেখ মুজিবের মামলার আইনজীবী হিসেবে। ২৪ জানুয়ারি ১৯৬২, আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খানের বাসভবনে আবুল মনসুর আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, আবু হোসেন সরকার, ইউসুফ আলী চৌধুরী, আতাউর রহমান খান প্রমুখ এক বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকের খবর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলে সামরিক সরকারের রোষানলে পড়তে হয় হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীকে। ঢাকা আসার আগে সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের মিয়া মমতাজের সাথে সাক্ষাৎ এবং বিদায়ী মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সংবর্ধনা সভাতে যোগ দেন। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এই ধরনের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক তৎপরতা সহ্য করার মতো মানসিক অবস্থা সামরিক সরকারের ছিল না। উল্লেখ্য, ক্ষমতার প্রশ্নে আইয়ুব খানের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সোহরাওয়ার্দী। উল্লিখিত কারণে ঢাকা থেকে ৩০ জানুয়ারি পাকিস্তানে পৌঁছালে, পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের জন্য বিপজ্জনক কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ঐদিনই পাকিস্তানের নিরাপত্তা আইনে করাচির বাসভবন থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন আইয়ুব খান ঢাকায় এসেই অভিযোগ করেন, 'সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের জন্মের সময় থেকেই রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত এবং পাকিস্তানের সংহতি নষ্ট করতে তৎপর'। সোহরাওয়ার্দীর গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রসমাজ আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করে। পূর্বেই বলা হয়েছে ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে আন্দোলন শুরু করে। ছাত্রলীগের সাথে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট নেতা মোহাম্মদ ফরহাদ অনুঘটকের কাজ করেন। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের দেখাশুনা করতেন।[৬] শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সামরিক শাসনবিরোধী উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৬২, পালিত হয় ছাত্র ধর্মঘট। সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকায় ধর্মঘটের খবর পত্রিকায় প্রকাশিত না হওয়ায় পরদিন ছাত্ররা সরকারি পত্রিকা আগুনে পুড়িয়ে দেয়। দীর্ঘ ৪১ মাস পর ছাত্ররা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে মিছিল বের করে, যার

প্রেরণা ছিল পূর্ববর্তী বছরে বঙ্গবন্ধুর 'স্বাধীন বাংলা" গঠনের পরিকল্পনা। ৫ ফেব্রুয়ারি বরিশাল বি এম কলেজের ছাত্ররা মিছিল বের করে এবং 'আইয়ুব খান টাউন হল' এই নাম পাল্টিয়ে পূর্বের নাম 'অশ্বিনী কুমার টাউন হল' নামফলক টাঙিয়ে দেয়। সমগ্র পূর্ব বাংলা ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল। পরিস্থিতি মোকাবেলায় সেনাবাহিনি মাঠে নামানো হয়। এ অবস্থায় ৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৭ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কেবল ঢাকা থেকেই আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের ২২৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। সোহরাওয়ার্দীর গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে আন্দোলন শুরু হলেও এর মূলে ছিল আইয়ুব খানের সংবিধান। ইতোমধ্যে ২৮ এপ্রিল জাতীয় এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন হয়ে যায়। ৮ জুন জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনে সামরিক শাসন প্রত্যাহার এবং সংবিধান পাস হয়। ১৮ জুন বঙ্গবন্ধু জেল থেকে মুক্ত হন। জুলাই-আগস্ট মাসে তাজউদ্দীন আহমদসহ বেশির ভাগ বিনা বিচারে আটক নেতাদের মুক্তি দেয়া হয়। সোহরাওয়ার্দী জেল থেকে ছাড়া পান ১৯ আগস্ট। মুক্তিপ্রাপ্তির ৬ দিনের মাথায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ৯ জন নেতা মিলে মৌলিক গণতন্ত্র প্রথা প্রত্যাখ্যান, শাসনতন্ত্র অকেজো, নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিসহ বেশ কিছু দাবি উত্থাপন করে এক বিবৃতি প্রদান করেন। যাকে 'নয় নেতার বিবৃতি' বলা হয়। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান, কেএসপির হামিদুল হক চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া, মুসলিম লীগের নুরুল আমিন ও ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মাহমুদ আলী এবং নেজামে ইসলামের পীর মুহসেন উদ্দিন (দুদু মিয়া)। বিভিন্ন শ্রেণি এবং পেশার সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ এই বিবৃতিকে অভিনন্দিত করেন। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে এই বিবৃতি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই বিবৃতির সমর্থনে ৮ জুলাই ঢাকার পল্টন ময়দানে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সদ্য কারামুক্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ ছিল ওই জনসভার প্রধান আকর্ষণ। এদিকে ৯ নেতার বিবৃতি প্রকাশের পর থেকে মন্ত্রীরা, সরকারি দলের নেতারা এবং সরকার পক্ষের সংবাদপত্রগুলো এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে মর্নিং নিউজ ও পশ্চিম পাকিস্তানের 'ডন' পত্রিকা নেতাদের সমালোচনা করে সম্পাদকীয় লেখে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সবুর খান বিবৃতিদাতাদের 'ব্যাবিলনের নয় জ্ঞানী' বলে ব্যঙ্গ করেন।[৭] 'নয় নেতার বিবৃতি' বাস্তবায়নের দাবিতে যখন রাজনীতি উত্তপ্ত এই সময়ে শরিফ কমিশনের শিক্ষা রিপোর্ট গ্রন্থাকারে প্রকাশ এবং এর কার্যকারিতা শুরু হওয়ায়, 'আগুনে ঘৃতাহুতি' দেয়ার মতো অবস্থা হলো। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান আবার ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠল। ১৭ সেপ্টেম্বর (১৯৬২) হরতাল আহবান করা হয়। ওই দিন ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের গুলিতে বাবুল ও

মোস্তফা নামে দুই ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই নিহত এবং ওয়াজিউল্লাহ নামে একজন আহত হন। পরদিন ওয়াজিউল্লাহ মারা যান।[৮] তিন দিনের মাথায় ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬২, সরকার শরিফ কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত করতে বাধ্য হয়।[৯] এদিকে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচনের পর পরই আইয়ুব খান নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের একটি কনভেনশ আহ্বান করেন। কনভেনশনে যোগ দেওয়া অধিকাংশই ছিলেন মুসলিম লীগের সদস্য। ৪ সেপ্টেম্বর (১৯৬২) এই কনভেনশনে চৌধুরী খালেকুজ্জামানকে সভাপতি করে মুসলিম লীগ পুনরুজ্জীবিত হয়। পরে অবশ্য আইয়ুব খান নিজেই সভাপতির পদটি নিয়ে নেন। এর পর থেকে মুসলিম লীগের এই অংশটির নাম হয় 'কনভেনশন মুসলিম লীগ'। ২৭ নভেম্বর (১৯৬২) মুসলিম লীগের বাকি অংশ নিয়ে একটি কাউন্সিল অধিবেশনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ পুনর্গঠন করা হয়। খাজা নাজিমুদ্দিনকে সভাপতি করে মুসলিম লীগের এই অংশটি 'কাউন্সিল মুসলিম লীগ' নামে পরিচিত হয়।

১৯৬৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুতে আয়োজিত সর্বদলীয় স্মরণসভায় 'আপত্তিকর বক্তব্য' রাখার জন্য সরকার বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করলে ২৮শে জানুয়ারি ১৯৬৬ বিচারে তাঁকে দুই বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়। তাঁকে কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করা হয় এবং একই দিন হাইকোর্ট থেকে তিনি জামিনে মুক্তি লাভ করেন। জেলগেটে বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনার দৃশ্য। সূত্র : *ইত্তেফাক*, ২৯শে জানুয়ারি ১৯৬৬, পৃ. ১

অন্যদিকে বিরোধীদলীয় নেতাদের উপলব্ধি হলো, সমগ্র পাকিস্তানভিত্তিক আন্দোলনকে অগ্রসর করার জন্য স্বৈরাচারবিরোধী সব মতের দল-গোষ্ঠী-ব্যক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি দলহীন প্লাটফর্ম বা মঞ্চ তৈরি করা দরকার। এ প্রক্রিয়ায় শামিল হলো, আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সরকারের বাধা অতিক্রম করে ৪ অক্টোবর ১৯৬২ তে লাহোরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে আহ্বায়ক করে গঠিত হয় ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এনডিএফ)। ৭ অক্টোবর